বাবার ট্রেনিং

শুজা রশীদ

১৯৭০, বাবা নাভারনের একটি হাসপাতালে সরকারি চাকরি করেন। তার আগের বছর ডাক্তারী পাশ করে এই কাজটি নেন তিনি। যশোরে অবস্থিত নাভারন শহরটি ছিলো ছিমছাম এবং ছোট। আমার বয়স তখন পাঁচ। অনেক কিছুই মনে নেই। আবছায়ার মতো শহরের চিত্রটি চোখে ভাসে। আমার দাদুর বাড়ি সাতক্ষীরার কালিগঞ্জ থানায়। নাভারন থেকে খুব বেশী দূরে নয়। পঞ্চাশ মাইলের মত, বাস চলে।

দাদু প্রায়শই আমার দাদীবুবু এবং ঝিমাকে নিয়ে চলে আসেন। ঝিমা হচ্ছেন দাদুর সৎমা। তিনি দাদুর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ছিলেন। দাদুর বাবা শেষ বয়সে তার দেখাশোনা করার জন্য স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে গরীব ঘরের একটি মেয়েকে নিয়ে আসেন। তার প্রথম স্ত্রী মারা গেছেন ততদিনে। ঝিমাকে বিয়ে করার কিছুদিন পরেই দাদুর বাবা মারা যান এবং ঝিমা আর বিয়ে-থা করেন নি। তার কোন সন্তান ছিলো না। আমরা তার প্রপৌত্র ও প্রপৌত্ররাই ছিলাম তার জীবন। ঝিমা খুব মজা করে কথা বলতেন এবং আমাকে ও আমার ছোট বোন রুশীকে খুব লাই দিতেন। আমরা ভাইবোন ঝিমা বলতে অজ্ঞান ছিলাম। আমার দাদীবুবু দেখতে ছিলেন খুব সুন্দর এবং চুপচাপ। তিনিও আমাদেরকে ভয়ানক আদর করতেন। ফলে তারা দুইজন যখন আমাদের বাসায় আসতেন তখন আমাদের দুই ভাইবোনের আনন্দের সীমা থাকতো না। রুশীর বয়েস তখন দুই। ছোটবেলা থেকেই সে একটু ঘ্যানঘ্যান করে। কারণে অকারণে কান্নাকাটি করে। তার নাঁকি কান্নার যন্ত্রনায় বাসায় থাকাই দায়। তাকে আদর করলেও সে কাঁদে। ভালো করে দুইটা কথা বললেও কাঁদে। যে কারণে প্রায়শই আমাকে বাবা-মায়ের কাছে বকুনি শুনতে হয়। আমার যে কোন দোষ নেই এই কথাটা আমি আর কাউকে বোঝাতে পারি না। বাসায় কেউ বেড়াতে এলে সমস্যা একটু কম হয়। রুশী তখন কান্নাকাটি করে কম। আমি বকুনি খাই কম।

বাবার চাকরি ইস্ট পাকিস্তান হেলথ সার্ভিসের অধীনে। বুরুজবাগান হাসপাতালের তিনি এসিস্ট্যাণ্ট সার্জেন। বাসা পেয়েছিলেন সরকারি। কিছুটা বাঁচোয়া। বেতন যা পেতেন তাতে সংসার মোটামুটি চলে যায় কিন্তু কিছু বাঁচে না। বাবার কাজটাও মায়ের ঠিক পছন্দ নয়। ঐ এলাকায় তখন খুন খারাবীর হার খুব বেশী। বাবাকে ডেথ সার্টিফিকেট লিখতে হয় হর হামেশা। মা বরাবরই একটু ভীতু ধরণের। সব কিছু নিয়েই দুশ্চিন্তা করেন। সামান্য কারণেই খুব মুষড়ে পড়েন। হাসপাতালের কাছাকাছি আমাদের বাসা। মাঝে মাঝে কাপড়ে ঢেকে লাশ নিয়ে যায় বাসার সামনে দিয়ে। মায়ের চোখে যদি কখনো পড়ে তাহলে সেই রাতে মায়ের ঘুম হারাম হয়ে গেলো। মা রাত জেগে কান্নাকাটি করতেন, নয়তো ছটফট করতেন। আমি আর রুশী বাবামায়ের সাথে একই ঘরে থাকি। মায়ের সাথে সাথে রুশীও নাকি স্বরে কাঁদে। তাদের

দুই জনার কান্না শোনা ছাড়া আমার আর উপায় কি? মায়ের কান্না চুপি চুপি। রুশীর তা নয়। সে হেঁড়ে গলায় সারা পাড়া মাত করে দিয়ে কাঁদে। কি যে ঝামেলা!

বাবার কাছেও কাজটা সব মিলিয়ে ঠিক পছন্দ হচ্ছিলো না। প্রথমত টাকাপয়সা ভালো না তারপরে আবার এতো লাশ নিয়ে কারবার। বাবাও অন্য কিছু করা যায় কিনা খুঁজছিলেন।

ইতিমধ্যে নাভারনে এক বিশাল সার্কাস দল এলো। আমিতো শুনেই যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। শুনেছি কতো নাকি বাঘ, ভল্লুক, হাতি এসেছে। এতো বড় সুযোগ কি নষ্ট করা যায়। আমি সকালে বায়না শুরু করলাম। রুশীকেও দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করলাম লজেন্স দিয়ে। সে আবার মায়ের মতো একটু ভীতু। বড় বড় বাঘ ভল্লুকের কথা শুনেই তার মুখ শুকিয়ে গেছে। অনেক সাধ্য সাধনার পরে শেষ পর্যন্ত বাবা-মাকে রাজি করানো গেলো। বাবা সরকারি গাড়িতে আমাদের নিয়ে গেলেন সার্কাস দেখাতে। আমার জীবনের প্রথম সার্কাস। এতো রকমের জীব জন্তু দেখে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠি। আমাকে সামলাতে বাবাকে খুব বেগ পেতে হয়। রুশী আবার এতো মানুষজন হৈ চৈ দেখে খুব ভড়কে গেলো। সে মায়ের আঁচল ছেড়ে নড়লই না। সেই সার্কাসের অন্যতম আকর্ষণ ছিলো কয়েকটি অতিকায় হাতি। সেই হাতির কাছাকাছি গিয়ে মা খুব ভয় পেয়ে গেলেন। জীবনে এটাই তার প্রথম হাতি দেখা নয় তবুও জন্তুগুলি যে এতো বিশাল হয় সেটা তার ধারণা ছিলো না। রুশী তারস্বরে কাঁদছিলো। মা তাকে নিয়ে দ্রুত দুরে সরে গেলেন। কিন্তু কোন এক অদ্ভূত কারণে আমি মোটেই ভয় পেলাম না। এমন নিরীহ দর্শন জন্তুটিকে ভয় পাবার কি আছে? পয়সা দিয়ে হাতির পিঠে চড়ানো হচ্ছে আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে। আমি বাবার কাছে বায়না ধরে নিজের জন্য এই দুর্লভ সুযোগের ব্যবস্থা করলাম। আমার হাতির পিঠে ওঠা হলো। ছোট্ট একটা জায়গার মধ্যে এক চক্কর দিয়ে হাতি যখন আমাদেরকে নামিয়ে দিলো তখন আমার মুখে বিজয়ের হাসি ও গর্ব। আমি বুক ফুলিয়ে মা এবং রুশীর দিকে হেঁটে গেলাম। মাকে দেখে মনে হলো তিনি এখনই মূর্ছা যাবেন। -কি করে উঠলি তুই ঐ জন্তুটার পিঠে?

বাসায় ফিরে এসেও মায়ের ভয় কাটলো না। রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে চিৎকার করে সবার ঘুম ভাঙালো। বাবা খুব বিরক্ত হলেন। - হাতি দেখে এমন কাণ্ড করার কোন মানে আছে!

পরদিন হলো আরেক কাণ্ড। দূরের কোন এক গ্রামে জোড়া খুন হয়েছে আগের রাতে। সেই লাশ বয়ে নিয়ে আসা হয়েছে হাসপাতালে। পড়বিতো পড় ঠিক মায়ের চোখের সামনেই। মা এক নজর দেখেই মূর্ছা গেলেন। ভাগ্যিস আমি কাছাকাছি ছিলাম। দৌড় দিয়ে পাশের বাসার মহিলাকে ডেকে নিয়ে এলাম। তিনিই মায়ের মাথায় পানি ঢেলে আর বাতাস করে পরিস্থিতি সামাল দিলেন।

সেইরাতেই বাবা সিদ্ধান্ত নিলেন এবার জোরেসোরে অন্য চাকরি খোঁজা দরকার। আগে থেকেই আর্মিতে যোগ দেবার তার ইচ্ছা ছিলো ভালো। চাকরি, বেতন ভালো, অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আছে। মায়ের সাথে আলাপ করে আর্মিতেই চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। যুদ্ধটুদ্ধ নিয়ে মায়ের স্বাভাবিকভাবেই ভয়ানক আতংক। কিন্তু তেমন সম্ভাবনা কিছু আছে বলে মনে হলো না।

পাকিস্তানে তখন ইয়াহিয়া খানের মার্শাল ল চলছে। ছোটখাটো গোলমাল হলেও বিশাল কোন কিছুর আলামত তখনও নেই। অন্যদিকে বাবা ডাক্তার। তাকে সরাসরি যুদ্ধে পাঠানোর কোন কারণও নেই - যদি তেমন যুদ্ধ বাঁধতও। সেই বছরেই আগস্ট মাসে বাবা আর্মিতে যোগ দিলেন। তার প্রথম পোস্টিং কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে। পদবী লেফটেন্যান্ট ডাক্তার। এক বছর কাজ করলে তার সিনিয়র অফিসারের 'সুপারিশ' (রিকমেণ্ডেশান) হলে তবে ক্যাপ্টেন হবেন। বাবা খুবই খুশী হলেন। তার বেতন যে শুধু বেড়ে যাবে তাই নয়, তাকে আর হররোজ লাশ নিয়ে কাজকারবার করতে হবে না। মায়েরও ভয়ভীতিটা হয়তো কাটবে কুমিল্লা গিয়ে। বাবা আমাদেরকে দেশের বাড়িতে আপাতত রেখে কুমিল্লায় চলে গেলেন কাজে যোগ দিতে। সেখানে বাসার ব্যবস্থা হলে আমাদেরকে নিয়ে যাবেন। খুব বেশীদিন অপেক্ষা করতে হলো না। মাস দুয়েক পরেই থাকার জায়গা হলো। ক্যান্টনমেন্ট এরিয়ার লাগোয়া একটি প্রাইভেট বাসা পাওয়া গেল। ক্যান্টনমেন্টে সরকারি বাসা আর ফাঁকা না থাকায় বাবা তাতেই রাজি হলেন যদিও ভাড়াটার অর্ধেক পকেট থেকে যাবে। বাকি অর্ধেক আসবে হাউস এলাউন্স থেকে। বাবা আমাদের নিয়ে এলেন দেশের বাড়ি থেকে।

কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে তখন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মিশ্র সমাবেশ। বাবাদের গ্রুপেই বেশ কয়েকজন পাঞ্জাবী ও পাঠান। বাবার সিও (কমান্ডিং অফিসার) লেফটেন্যান্ট কর্ণেল রমিজ উদ্দিন পূর্ব পাকিস্তানী। তিনি মানুষ খুবই ভালো। তার রিপোর্টের উপরেই নির্ভর করবে বাবার পদোন্নতি। পশ্চিম পাকিস্তানের উচ্চপদস্থ অফিসারেরাও অবশ্য সকলেই ভালো ছিলেন, কিন্তু তারপরও বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেঁধে যেতো। ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ এর শেষ দিকে ভোটের ব্যবস্থা করলেন। ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও শেখ মুজিবুর রহমানকে সরকার গঠন করতে দেয়া হলো না। জুলফিকার আলী ভুট্টো নানান টালবাহানা করতে লাগলেন। পরিস্থিতি দ্রুত খারাপ হতে থাকে। তার আঁচ আর্মির ভেতরেও পড়ে। অফিসার এবং জোয়ানদের মধ্যে খিটিমিটি ঝগড়াঝাটি বেঁধে যায়, কিন্তু কোনটাই অবশ্য বেশীদূর গড়ায় না।

ইতিমধ্যে বাবাকে একবার পশ্চিম পাকিস্তানে ট্রেনিংয়ের জন্য পাঠানোর কথা উঠলো। সাথে আরো বেশ কয়েকজন ডাক্তার যাবেন। মা বিশেষ একটা খুশী হতে পারলেন না। বাবা ট্রেনিংয়ে চলে গেলে মাকে আমাদের দুই ভাইবোনকে নিয়ে হয় দেশের বাড়িতে দাদুদের সাথে থাকতে হবে নইলে খুলনা শহরে আমার বড় খালার ওখানে থাকতে হবে। বাবার সাথে মায়ের বিয়ের পরে বাবা ডাক্তারি পড়তে যান। মাকে বেশ কিছুদিন দূরে দূরে থাকতে হয়েছিলো। ডাক্তারি পাশ করার পরও দুজনের একসাথে থাকা হয়নি বেশ খানিকটা সময়। আবার বিরহের আশংকায় মা খুব মুষড়ে পড়লেন। বাবা অবশ্য আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেন এই বলে যে খুব শীঘ্রই তিনি আমাদেরকে নিয়ে যাবেন। সংগে করেই নিতে পারতেন কিন্তু সেখানে কাউকে চেনেন না, জানেন না, বিশেষ করে বাচ্চারা আছে। দুই একজন পরিচিত মানুষ থাকেন করাচি। সুযোগ সুবিধা তখনও তেমন একটা হয়নি। মা রাতে কান্নাকাটি শুরু করলেন। আমার

কাছে ব্যাপারটা ঠিক পরিষ্কার হলো না। দাদুর বাড়ি অথবা খালার বাড়ি মানেই হচ্ছে হৈ চৈ, ছুটাছুটি, মহা ফূর্তির সময়। মায়ের এমন কান্নাকাটির অর্থ কি?

দূর্ভাগ্যবশতঃ অল্প কয়েকদিন পরেই ট্রেনিংয়ের পরিকল্পনা পাল্টে গেলো। এই মুহূর্তে কাউকে ট্রেনিংয়ে না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। মায়ের খুশী কে দেখে। আমার মনটা একটু খারাপ হলো। কিন্তু ক্যান্টনমেন্টের ভেতরের জীবনও খুব মন্দ নয়। আমার বেশ কিছু বন্ধু জুটে গেছে। তাদের সাথেই খুব ছুটাছুটি করে খেলি। সারাক্ষণ আর রুশীর ঘ্যানঘ্যান শুনতে হয় না। বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজন উর্দূভাষীও আছে। দুই একটা উর্দূ শব্দও মুখস্ত হয়ে গেলো। মা অবশ্য বেশ একটু যন্ত্রণাতেই ফেললেন। সকাল বিকাল শুধু আমাকে পড়ানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। ভুল হলেই ভয়ানক বকুনি খেতে হয়। মায়ের মেজাজ খুব কড়া। যখন বকুনি দেন তখন দেখে বোঝার কোন উপায়ই নেই যে সামান্য কারণেই তিনি হাপুস নয়নে কাঁদতে পারেন।

মাস দুয়েক পরে বাবার সিও বদল হলো। লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল জাহাংগীর নামে এক ভদ্রলোকের অধীনে কাজ করতে হবে তাকে। এই লোকটিও নাকি খুবই ভালো। তিনিও পূর্ব পাকিস্তানী। যদিও বাইরে থেকে পূর্ব-পশ্চিমে কোন পার্থক্য আছে বোঝা যায় না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে খুব ধীরে ধীরে বুদবুদের মতো সেটা জমছে। পরপর দু'টা ঘটনায় সেটা খানিকটা হলেও আত্মপ্রকাশ করলো। প্রথম ঘটনাটা ঘটলো এক পশ্চিম পাকিস্তানী জেনারেলের সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ নিয়ে। তার আসা উপলক্ষ্যে বিশাল পার্টির ব্যবস্থা হলো। জেনারেল ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা মদ টেনে থাকেন। আয়েশে সুরা টানলেন তারা। পরে দেখা গেলো মোট খরচের একটা অংশই সুরার দাম। সকলকে পার্টির খরচ বহন করতে হয়। খাবারের মূল্য নিয়ে কেউ কোন আপত্তি না করলেও সুরার মূল্য হিসাবে পড়পড়তা ৩০ টাকা করে দিতে বেশ কয়েকজন আপত্তি তুললেন। বাবাও তাদের মধ্যে একজন। তার সহকর্মী বাঙালী ডাক্তার মহসীন, ফারুক, জাহাংগীর এবং বেশ কয়েকজন পাঠান ডাক্তারও আপত্তি করলেন। অধিকাংশ পাঠানই আসতো পাকিস্তানের নর্দার্ন ফ্রন্টিয়ার থেকে। পাঞ্জাবীদের তুলনায় তারা পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতি অনেক বেশী সহমর্মী ছিলো। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যেতো যেখানে পাকিস্তানের অন্যান্য এলাকার মানুষেরা নিজেদের দূরত্ব তৈরী করতো পাঠানেরা সেখানে অনেক ঘনিষ্ঠ হয়ে যেতো এই এলাকার মানুষের সাথে। প্রচুর বাক-বিতণ্ডা এবং উচ্চপদস্থ অফিসারদের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত উপরোক্ত সমস্যাটির সমাধান হয়। বাবারা সুরার দাম দিলেন না। কিন্তু অনেকের স্মৃতিতে এই ঘটনাটা পাকাপোক্তভাবে আসন গাড়লো।

দ্বিতীয় খটনাটি ঘটলো অফিসারদের এক মিটিংয়ে। সেখানে অনেকেই সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে বক্তব্য রাখছেন। স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিমের সকলেই খানিকটা দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করছেন। সকলে জানেন বর্তমান পরিস্থিতি হঠাৎ করে খারাপের দিকে মোড় নিতে পারে। কেউ কেউ ভেতরে ভেতরে পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনীতিবিদদের হঠকারিতা নিয়ে বিরক্ত হলেও তা প্রকাশ করতে চান না। অনেক পশ্চিমের অফিসারেরা আবার নিজেদের মতামত ব্যক্ত করতে ব্যস্ত। তারা মনে করতেন আওয়ামী লীগের সরকার গঠন করবার অধিকার নেই। বোঝাই

যেতো তাদের ধারণা ছিলো পশ্চিমের রাজনীতিবিদরাই সমগ্র পাকিস্তানের শাসনভারে থাকবে। স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব পাকিস্তানের অফিসারদের অভিমত ছিলো ঠিক উল্টো। আওয়ামী লীগ যদি ভোটে জিতে থাকে তাহলে তাদেরই সরকার গঠন করবার অধিকার রয়েছে। পশ্চিমী রাজনীতিবিদদের এই সব ধানাই পানাই দেশটাকে আরো অরাজকতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বাবা কথা বলার সুযোগ পেয়ে যথাযথ যুক্তি দিয়ে নিজের বক্তব্য রাখলেন। কিন্তু সব পূর্ব পাকিস্তানী অফিসারেরা মেজাজ ঠিক রাখতে পারলেন না। এডুকেশনের লেফটেন্যান্ট মকবুল বক্তব্য রাখতে গিয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়লেন এবং এক পর্যায়ে বলেই বসলেন যে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাতন্ত্র ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই, পশ্চিম পাকিস্তানীদের এই সমস্ত টাল-বাহানা সহ্য করবার তাদের কোন প্রয়োজন নেই। এই কথা শুনে মিটিংয়ে হৈ হট্টগোল লেগে গেলো। চিৎকার পাল্টা চিৎকার শুরু হলো। পাঞ্জাবীরা কট্টর পশ্চিম পাকিস্তানবাদী। তারাই বেশী উত্তেজিত হয়ে উঠলো। শেষ পর্যন্ত লেঃ মকবুলকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। কিন্তু বাঙালী অফিসাররা তাকে বাহবা দিলেন। তিনি তাদের সকলের মনের কথাই জোরে সোরেই বলেছেন - বলাটা কতখানি ঠিক হয়েছে সেটা নিয়ে কেউ আর চিন্তা করলেন না। কিন্তু এই ঘটনা দুটির পরে বাবাদের দিকে অনেকেই একটু বাঁকা চোখে তাকাতে লাগলেন।

সত্তুরের সামুদ্রিক ঝড়ে নোয়াখালী সহ সমুদ্র উপকূলবর্তী অনেক এলাকার প্রচন্ডক্ষতি হলো। ফসল নষ্ট হওয়া থেকে শুরু করে ঘরবাড়ি ভেসে যাওয়া, মানুষের জীবননাশ হওয়া - কোন কিছুই বাদ থাকলো না। বাবারা সেখানে গেলেন অসুস্থদের চিকিৎসা করতে। পরিস্থিতি দেখে নিজেদেরকে স্থির রাখাই তাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কত মানুষের লাশ যে তাদের চোখে পড়লো। যারা বেঁচে আছে তাদের অবস্থাও কোন অংশে ভালো নয়। খাবার দাবার কোথাও নেই বললেই চলে। পানির তোড়ে গোলার ধান সব ভেসে গেছে। ঘর-বাড়ির কোন চিহ্ন নেই কোথাও। গতকালকের ধনী চাষী আজ স্বর্বস্বান্ত। পিপাসার পানি নেই, ক্ষুধার অন্ন নেই। বাবারা ঘুরে ঘুরে অসুখ বিসুখ থেকে মানুষকে রক্ষা করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণাই তখন বড় সমস্যা। সাহায্য আসতেও সময় লাগে। যেটুকু আসছে তাও যথেষ্ট নয়। সেই সময় জানা গেলো নিকটবর্তি এলাকার এক হিন্দু ধর্মীয় ধনী চাষী, তার পদবী সাধু, তিনি এক লঙ্গরখানা খুলেছেন। সৌভাগ্যবশতঃ তার বাড়িঘর এবং গোলায় সংরক্ষিত ফসলের বেশি ক্ষতি হয়নি। কোন এক যাদুর বলে পানি তার ভিটেমাটিকে সম্পূর্ণ গ্রাস করেনি। বাবার ধারণা তার বাড়ির চারপাশ ঘিরে থাকা ঘন নারকেলের বনই তার বাড়িটাকে পানির তোড় থেকে বাঁচিয়ে দেয়। সাধু মানুষ হিসেবে অসম্ভব ভালো। পাক্কা দুই সপ্তাহ নিজের আঙ্গিনায় তিনি বিনামূল্যে সকলের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করলেন। যাদের মাথা গোঁজার জায়গা নেই তাদের ক্ষণস্থায়ী ঠাঁইয়ের ব্যবস্থাও করলেন। যে সমস্ত বড়লোক গৃহস্থেরা সর্বস্ব হারিয়েছে তারা তাদের অহমিকা বর্জন করে যে তার লঙ্গরখানায় আসবেন না সাধু তাও ঠিকই বুঝেছিলেন। তিনি মানুষ দিয়ে সেই সব গৃহস্থদের ঘরে ঘরে খাবার ও পানি পাঠিয়ে দিলেন। বাবা তার এই ব্যবহারে খুবই মুগ্ধ হয়ে যান। তার মতো আরো অনেক গৃহস্থই পানির কবল থেকে বেঁচে গেছেন কিন্তু এই ধরণের উদ্যোগ তারা কেউই নেননি। নিজের গোলা খুলে অন্যদের অন্নের

ব্যবস্থা করতে হলে অনেক উদার মনের মানুষ হওয়া প্রয়োজন, এমন দূর্যোগের মধ্যেও। বাবার সাথে সাধুর যখন দেখা হলো বাবা সাধুকে তার এই অসম্ভব উদারতার কারণ জিজ্ঞেস না করে পারলেন না। সাধু উত্তর দিলেন, 'ভগবান আমাকে রক্ষা করেছেন এই দূর্যোগ থেকে। যে ধান বানের জলে ভেসে যেতো সেই ধান আমি হতভাগ্যদের জন্য দান করছি। এটা আমার কর্তব্য মনে করি। মানুষের এই আকালে যদি না এগিয়ে আসি তাহলে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেই পাপ করেছি।' সেই সাধুর কথা বাবা কখনো ভোলেননি। দুঃসময়ের উদারতার চেয়ে মহিমাময় বোধহয় আর কিছু নেই।

বাবার ট্রেনিংয়ে যাবার কথা আবার উঠলো। আগেরবার স্থগিত হয়ে গেলেও এবার তেমন কোন কিছুর আলামত দেখা গেলো না। মায়ের মুখ আবার থমথমে হয়ে উঠলো। পড়তে গিয়ে আমি বেশী বেশী বকুনি খেতে লাগলাম। রুশীর নাঁকি কথা বাড়তে লাগলো। বাসার মধ্যে একটা বিশ্রী অবস্থা। এখনও দিন তারিখ ঠিক হয়নি। কিন্তু মনে হচ্ছে ৭১ এর জানুয়ারী - ফেব্রুয়ারীর দিকেই হয়তো যাওয়া হবে। আমাদের আত্মীয় স্বজনদের কেউ কেউ একটু চিন্তায় পড়লেন। রাজনৈতিক অবস্থা যেদিকে মোড় নিচ্ছে তাতে এই সময়ে পশ্চিমে পাকিস্তানে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। দেশের মধ্যে অস্থিরতা বাড়ছে। আওয়ামী লীগকে সরকার গঠন করতে দেবার কোন চিহ্ন এখনও দেখা যাচ্ছে না। যে কোন সময় কিছু একটা হয়ে যেতে পারে। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ ক্রমশঃই অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি এখনও অতিমাত্রায় স্পষ্ট। পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে আরেকটা আন্দোলন শুরু হয়ে যাওয়াটা মাত্র সময়ের ব্যাপার। আলাদা হয়ে যাবার কথা এখনও কেউ পরিষ্কার করে বলছেন না কিন্তু অনেকেই যে ভাবছেন সেটা খুব একটা ব্যাপার নয়। সকলের মনেই চিন্তা - একটা বড় ধরণের গোলমাল পাকাতে কতদিন। কিন্তু এই সব চিন্তা করে ট্রেনিংয়ে না যাওয়াটা খুব যুক্তিযুক্ত ছিলো না। আর্মির ভেতরে পরিস্থিতি আজও স্বাভাবিক। অদূর ভবিষ্যতে রাজনৈতিকভাবে কোন সমস্যার সৃষ্টি হবে কিনা তা পরিষ্কার করে বলা যায় না। বাবা যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিলেন। তার বন্ধু ডাক্তার মহসীন ও জাহাংগীর পূর্বেই ট্রেনিং শেষ করেছেন, তারা কুমিল্লায় থেকে যান।

শেষ পর্যন্ত ফেব্রুয়ারী মাসেই বাবার পশ্চিম পাকিস্তানে ট্রেনিংয়ের জন্য যাওয়া ঠিক হলো। আমাদেরকে তিনি সাথে নিয়ে যেতে পারলে সরকার সমস্ত খরচ বহন করবে, অথবা পরবর্তি ছয় মাসের মধ্যে নিতে পারলেও খরচ দিয়ে দেবে। কিন্তু আমাদের থাকার অনিশ্চয়তা থাকায় বাবা শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে রেখে যাওয়াটাই ঠিক করলেন। তার সিদ্ধান্তের পেছনে অন্য একটি কারণও ছিলো। কিন্তু সেটা আমি টের পেলাম বেশ কয়েকমাস পরে। ঠিক হলো আমরা প্রথমে দাদুর বাড়িতে গিয়ে থাকবো। সেখান থেকে পরে খুলনায় খালার বাড়িতে চলে আসবো। বাবার ইচ্ছা যত দ্রুত সম্ভব আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া। ছয় মাসের মধ্যে নিতে পারলে খুবই ভালো। অনেকগুলো পয়সা বাঁচবে।

জানুয়ারী মাসে যশোর কোর্ট থেকে বাবার কাছে একটা সমন এলো। বাবা নাভারন থাক্তে একজন মৃতের ডেথ সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। সেই কেস কোর্টে গেছে। এখন বিবাদী পক্ষ

বাবাকে কোর্টে ডেকেছে স্বাক্ষী দিতে। এর আগেও এই ধরণের ডাক এসেছে কিন্তু কখনও সত্যি সত্যিই বাবাকে কোর্টে যেতে হয় নি। এবার আর না গিয়ে থাকা গেলো না, বাবা ঠিক করলেন এই সুযোগে আমাদের সবাইকে সাথে করেই নিয়ে যাবেন। দাদুর বাড়ি যশোর থেকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ। তিনি আমাদেরকে সেখানে রেখেই ফিরে আসবেন এবং পরে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যাবেন। আমার আনন্দের সীমা থাকলো না। দাদুর বাড়ির আম-কাঁঠাল-কুল-জাম-নারকেলের বাগান, আখ ক্ষেত, বিশাল বিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেত, গরুর পাল, রাখালের বাঁশী - সব মিলিয়ে কি যে এক অসম্ভব ভালো লাগা! জন্মের পর বেশ কয়েকটা বছর সেখানেই কেটেছে আমার। দাদুর মাটির উঠোনে প্রথম হামাগুড়ি কেটেছি, পা পা করে হেঁটেছি, জীর্ণ পোশাক পরা গ্রাম্য মহিলাদের কোলে কোলে ঘুরেছি। সেইসব স্মৃতি বোধহয় আমার মস্তিষ্কের গভীরে স্থায়ী নিবাস গেড়েছে। নইলে গাঁয়ের কথা শুনলেই শরীরটা এমন শির শির করে ওঠে কেন? এ যে কি একটা ভালো লাগার অনুভূতি!

শুজা রশীদ, টরেন্টো, কানাডা

লেখক পরিচিতিঃ

জনাব শুজা রশীদ বাংলাদেশের খুলনা শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তার শিশুবেলা ছিল যেমন বৈচিত্রময় তেমনি আনন্দে ঘেরা। বাবা মার সাথে ভ্রমন করে বেড়িয়েছোন বাংলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাবা তৎকালীন একজন সামরিক কর্মকর্তা হওয়ার কারনে তিনি এবং তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে যুদ্ধবন্দী হিসাবে পাকিস্তান কারাগারে থাকতে হয়েছিল। একজন মেধাবী ছত্র হিসাবে জনাব সুজা রশীদের শিক্ষা জীবন শুরু হয়েছিল ঝিনাইদাহ ক্যাডেট কলেজে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফলিত পদার্থবিদ্যা এবং ইলেক্ট্রনিক্স এর উপর স্নাতক ও স্নাতোকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। এর পর তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার বিজ্ঞানে পড়াশোনার জন্য মার্কিন মুল্লুকে পাড়ি জমান এবং সেখানের ওকল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতোকত্তর শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি আই, টি শিল্পের সাথে জড়িত হয়ে পড়েন। বর্তমানে তিনি তার স্ত্রী ও সন্তান সহ কানাডাতে বসবাস করছেন। তিনি বাংলাদেশের সাপ্তাহীক যায় যায় দিন এর একজন নিয়মিত লেখক। সম্প্রতি তাঁর জীবনের ফেলে আসা দিনগুলো নিয়ে তিনি কর্ণফুলী'তে লিখতে উদ্দ্যেগ নিয়েছেন যা পরবর্তিতে একটি বই আকারে ছাপার কথা তিনি ভাবছেন। বইটি'র নাম দিয়েছেন 'দামামা'। মহান মুক্তিযুদ্বের স্মৃতি রচনায় এ বইটিতে থাকবে অনেক জীবন্তভাবে ফুটিয়ে তোলা সুন্দর ও সুখপাঠ্য তথ্য। তার অপ্রকাশিত এ অনবদ্য লেখাটি আমরা ধারাবাহিকভাবে আগামী দশ সপ্তাহ পর্যন্ত 'সাপ্তাহীক কর্ণফুলী'তে ছাপিয়ে যাবো বলে আশা করি। বিদগ্ধ পাঠকদের কাছে সুজা রশিদে'র এ ধারাবাহিক লেখাটি কেমন লাগছে জানালে আমরা যারপর নাই আনন্দিত হবো।